বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
(বিএফআরআই)
বর্ষ ০২ সংখ্যা ০১
জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১৬
নিউজলেটার
বন ও বনজ সম্পদের গবেষণায় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

বিএফআরআই এ বৃক্ষরোপণ অভিযান ২০১৬ উদ্‌যাপন

গত ১০ আগস্ট ২০১৬ খ্রি. তারিখে বিএফআরআইতে বৃক্ষরোপণ অভিযান ২০১৬ উদযাপন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বিএফআরআই এর পরিচালক ড. শাহীন আক্তার। সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন জীবিকার প্রয়োজনে আমাদেরকে অবশ্যই বৃক্ষরোপণ করতে হবে। তবে বৃক্ষরোপণের সময় আমাদেরকে জীব-বৈচিত্র্যের দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। এমন গাছ রোপণ করব

বিএফআরআই এ বৃক্ষরোপণ ২০১৬ উদ্‌যাপন

যাতে করে বন্য প্রাণীর অভয়াশ্রম হয় সাথে সাথে ঔষধি ও দেশীয় প্রজাতি বৃক্ষও বাদ না পড়ে সেদিকে নজর দিতে হবে। সভায় বিএফআরআই এর সর্বস্তরের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে বনজ সম্পদ উইং এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. খুরশীদ আকতার, বনজ ব্যপস্থাপনা উইং এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ মহীউদ্দিন, বিভাগীয় কর্মকর্তা মিসেস হাসিনা মরিয়ম, বিভাগীয় কর্মকর্তা (প্রশাসন) মো. রফিকুল ইসলাম। মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. খুরশীদ আকতার বলেন আমাদের চাকুরী, কর্ম ও গবেষণা সবই বৃক্ষের সাথে সম্পর্কিত। তাই দেশের সবাই গাছ লাগানোর কথা বললেও আমরা বলবো যে গুণগত মানসম্পন্ন গাছ লাগাবো। বিলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদ ধূপ গাছের চারা লাগিয়ে বৃক্ষরোপণ অভিযান ২০১৬ উদ্বোধন করেন পরিচালক ড. শাহীন আক্তার।

[redacted]

গত ১৫ আগস্ট ২০১৬ খ্রি. তারিখে বিএফআরআইতে জাতির জনক 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' এর ৪১ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। উপলক্ষে বিএফআরআই এর অডিটোরিয়ামে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় বিএফআরআই এর পরিচালক ড. শাহীন আক্তার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিএফআরআইতে জাতীয় শোক দিবস পালন

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি সকলকে গভীর দেশপ্রেমের সাথে কাজ করে বঙ্গবন্ধুর রক্তের ঋণ শোধ করার কথা বলেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফল নেতৃত্বে ও নির্দেশনায় দেশ গড়ার কাজে সবাইকে নিরলসভাবে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানান। সভায় বিএফআরআই এর সর্বস্তরের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন এবং অনেকে বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনের আলোচনা করেন। আলোচনা সভা শেষে ১৫ আগষ্ট শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনাসহ দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

“রাসায়নিক সংরক্ষণী প্রয়োগে কাঠ, বাঁশ, ছন ইত্যাদির আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি” বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বিএফআরআই এর বনজ সম্পদ উইং এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. খুরশীদ আকতারের সভাপতিত্বে নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার কালিগ্রাম ইউনিয়নে “রাসায়নিক সংরক্ষণী প্রয়োগে কাঠ, বাঁশ, ছন ইত্যাদির আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি” বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক এবং শাহ কৃষি তথ্য পাঠাগার ও কৃষি যাদুঘর, কালিগ্রাম, মান্দা এর প্রতিষ্ঠাতা জনাব মো. জাহাঙ্গীর আলম শাহ্। অনুষ্ঠানে সাংবাদিক, কাঠ মিস্ত্রি, বাঁশ চাষী, ফার্নিচার ব্যবসায়ী, কৃষক এবং বাঁশের পণ্য তৈরির কারিগরসহ ৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণ

সভাপতি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাঠ, বাঁশ, ছন ইত্যাদি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, রাসায়নিক সংরক্ষণী প্রয়োগে আসবাবপত্র ও গৃহ নিমার্ণ সামগ্রীর স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি ও সঠিক ব্যবহার সর্ম্পকে ধারণা প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি প্রযুক্তিটি ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে ১০% সিসিবি (কপার-ক্রোম-বরিক এসিড) এবং ১০% বিবি (বোরাক্স-বরিক এসিড) দ্রবণ তৈরীর প্রক্রিয়া হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কাঠ ও বাঁশের ব্যবহারিক আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তিটি ব্যবহার করা হলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে এবং বনজ সম্পদ সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে মর্মে কাঠ ও ফার্নিচার ব্যবসায়ীগণ আশা ব্যক্ত করেন।

রাবার গাছের ল্যাটেক্স বৃদ্ধিতে পুষ্টি মৌল ব্যবস্থাপনা

রাবারের মূল উৎস হল রাবার গাছ। এ গাছ থেকে যে কষ উৎপন্ন হয় তা ”ল্যাটেক্স” নামে পরিচিত। ল্যাটেক্স স্প্যানিশ শব্দ যার অর্থ দুধ। দুধের ন্যায় সাদা এ পদার্থকে রসায়নের ভাষায় হাইড্রোসল বলা হয় । বয়স কিংবা ক্লোন ভেদে ল্যাটেক্স হতে ২২-৪৮% ডিআরসি (Dry Rubber Content i.e. Rubber Sheet) পাওয়া যায়। রাবার এর বহুবিধ ব্যবহার বিশ্ব জুড়ে স্বীকৃত। শিল্প কারখানা, যোগাযোগ ব্যবস্থার নির্মাণ সামগ্রী, বিমান, লঞ্চ ও মোটর গাড়ীর চাকা তৈরি, রাস্তার কার্পেটিং ইত্যাদিতে রাবারের ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে ল্যাটেক্স এবং রাবার থেকে ২২০০ রকমের ব্যবহার সামগ্রী তৈরি করা হয়েছে, যার নমুনা মালয়েশিয়ার যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।

ল্যাটেক্স উৎপাদন বন্ধ হবার পর আহরিত রাবার কাঠ দিয়ে আসবাবপত্র ও পার্টিক্যাল বোর্ড তৈরি করা যায়। এতে খরচ কম হয় এবং গুণগত মানও ভাল থাকে। রাবারের ডালপালা পুরোটাই জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ভারতে রাবারের বীজ থেকে ১২-১৬% তেল উৎপাদন করে থাকে; যা রং তৈরি, বার্নিশ এবং চামড়া শিল্পে ব্যবহার করা হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নয়ন ও গ্রীনহাউজ প্রতিক্রিয়া কমাতে রাবার গাছের জুড়ি নেই। রাবার উৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম। রাবার উৎপাদন প্রক্রিয়া ৫১টি উপাদান (Factor) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এর মধ্যে বাগান ব্যবস্থাপনা ও ল্যাটেক্স প্রক্রিয়াজাতকরণ রাবার উৎপাদনকারী কর্তৃপক্ষের হাতে নিয়ন্ত্রিত। রাবার চাষাবাদে মাটি ও প্রকৃতি পুষ্টি মৌল যোগায়, কিন্তু মাটির এ উর্বরতা শক্তি দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। অথচ রাবার গাছ হতে প্রতিনিয়ত ল্যাটেক্স সংগ্রহের ফলে গাছ প্রয়োজনীয় পুষ্টি মৌল হারাচ্ছে, যা মাটি হতে পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই প্রয়োজন পুষ্টি মৌল সরবরাহ।

রাবার গাছের বিভিন্ন পুষ্টি মৌলের মধ্যে নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশিয়াম অপরিহার্য; যা প্রধানত ইউরিয়া, ট্রিপল সুপার ফসফেট (টিএসপি) এবং মিউরেট অব পটাশ (এমপি) জাতীয় সার থেকেই সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এ সমস্ত পুষ্টিমৌলের বহুবিধ প্রভাব রয়েছে। এর মধ্যে নাইট্রোজেন গাছের কোষ তৈরিতে ও বর্ধনে অপরিহার্য। এর অভাবে ক্লোরোফিল ও প্রোটিন তৈরি বাধাপ্রাপ্ত হয়; যার ফলে গাছের পাতা ছোট হতে থাকে এবং হলুদ বর্ণ ধারণ করে। এতে গাছের ও ডালপালার যথাযথ বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। গাছের সালোক-সংশ্লেষণ ও প্রস্বেদনে ফসফরাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর অভাবে গাছ নিউক্লিক এসিড ও ফসফোলিপিড গ্রহণ করতে পারে না। ফলে গাছের বেড় কমে যায়, পাতার সংখ্যা কম হয় এবং শিকড় বৃদ্ধিতেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

৩য় পৃষ্ঠায়....

নাইট্রোজেনের অভাব

পটাশিয়ামের অভাব

ফসফরাসের অভাব

পটাশিয়াম রাবার গাছে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ক্লোরোফিল এবং চর্বি হিসাবে স্থায়ীভাবে থাকে যা খাদ্য তৈরি এবং উহা গাছের বিভিন্ন অংশে সরবরাহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও গাছে ম্যাগনেশিয়ামের আধিক্য কমানোর জন্য পটাশিয়ামের প্রয়োজন। কারণ রাবার গাছে ম্যাগনেশিয়ামের পরিমাণ বেশি হলে ল্যাটেক্স জমে যায়; এতে রাবারের গুনগতমান হ্রাস পায়। পটাশিয়ামের অভাবে গাছের বৃদ্ধি, বেড়, উচ্চতা, আকার ও পাতার সংখ্যা কমে যায়। ইহা গাছের কর্তিত বাকল পূরণে বা ভরাট করায় সাহায্য করে, যা ল্যাটেক্স উৎপাদনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রয়োগকৃত সারের ৪০% গাছের বর্ধনে এবং ৫০-৬০% ল্যাটেক্স উৎপাদনে গাছ ব্যবহার করে থাকে। বিজ্ঞানীগণ পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, পরিপক্ক রাবার গাছ হতে ১ (এক) কেজি ল্যাটেক্স উৎপাদনে ৬.৭১ গ্রাম নাইট্রোজেন, ১.৬৪ গ্রাম ফসফরাস এবং ৫.৯২ গ্রাম পটাশ সার প্রয়োজন হয়।

বাংলাদেশে রাবার গাছের ঝরা পাতা থেকে হেক্টর প্রতি ৬১-৭১ কেজি ইউরিয়া, ৪.৮৩-৫.৪৪ কেজি টিএসপি এবং ১৫.৪৮-১৮.৪৪ কেজি এমপি সার সমপরিমাণ পুষ্টি মৌল পাওয়া যায়।

সাধারণত সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে অর্থাৎ মৌসুমী বৃষ্টিপাত শেষ হবার পর আগাছা পরিষ্কার করে গাছের গোড়ার চারদিকে ১.৩ মিটার বেড় জুড়ে ৩-৪ সে.মি. মাটি আলগা করে (খাদ্য গ্রহণকারী শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত না করে) সার প্রয়োগ করা হলে ল্যাটেক্স উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এতে সারের অপচয়ও কম হবে। ধাপকাটা (Terrace) পাহাড়ী ঢালে পরিমিত পরিমাণ সার ঢালের উপরে ৪/৫ টি গর্ত করে প্রয়োগ করতে হবে। পরিপক্ক রাবার বাগানে প্রতি বছর সার প্রয়োগ করতে হবে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত রাবার বিষয়ক গবেষণার ফলাফল, বাগান ব্যবস্থাপনা, মৃত্তিকা পরিবেশ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় পরিপক্ক রাবার বাগানে গাছ প্রতি ৭৫-১৫০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০-১০০ গ্রাম মিউরেট অব পটাশ প্রতি বছর প্রয়োগের পরামর্শ প্রদান করে। টিএসপি সার এক বছর কিংবা দু বছর পর পর ১০০-২০০ গ্রাম প্রয়োগ করা যেতে পারে। কারণ অম্লীয় মাটিতে প্রয়োগকৃত টিএসপি সার উদ্ভিদকর্তৃক গ্রহণযোগ্য অবস্থায় সহজে আসতে পারে না। এক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারে ১০০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করে অম্লীয়ভাব কমালে ল্যাটেক্স উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। তবে পাহাড়ী মাটিতে টিএসপি সার কম ব্যবহার করাই উত্তম।

বাংলাদেশে রাবার গাছের বর্ধন ও ল্যাটেক্স উৎপাদন এবং পাতায় সজীবতার অভাব দেখে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, গাছে খাদ্যের অভাব রয়েছে। যেখানে ভারত এবং মালয়েশিয়ায় হেক্টর প্রতি ঝরাপাতার পরিমাণ যথাক্রমে ৪.০-৭.৮৬ এবং ২.৫-৭.৭৬ টন/হেক্টর, সেখানে বাংলাদেশে হেক্টর প্রতি উহা ২-৪ টন। রাবার গাছ মাতৃ দুধের মত শুধুমাত্র ঝরাপাতা থেকেই উহার খাদ্যের ২০-৩০% গ্রহণ করে। কাজেই রাবার গাছ কর্তৃক ঝরাপাতা না পুড়িয়ে যেখানে পড়ে সেখানে পঁচানোর ব্যবস্থা করলে মাটিতে খাদ্যের পরিমাণ বাড়াবে এবং মাটিতে জৈব পদার্থ ও অনুজীবের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, যা জৈব প্রক্রিয়ায় মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। কর্তিত আগাছা ও পাতা না পুড়িয়ে মালচিং হিসাবে গাছের গোড়ায় ব্যবহার করলে মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণে সহায়ক হবে, যা খরা মৌসুমে ল্যাটেক্স উৎপাদনে উপযোগী। রাসায়নিক সার প্রয়োগ করার পর অবশ্যই উহা মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। সম্ভব হলে নির্ধারিত মাত্রার ইউরিয়া সার দুইভাগে ভাগ করে ১ম ভাগ মৌসুমী বৃষ্টিপাত শুরু (এপ্রিল-মে) এবং অবশিষ্টভাগ মৌসুমী বৃষ্টিপাত শেষে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) প্রয়োগ করতে হবে। খাদ্য গ্রহণ ব্যবস্থা যথাযথ না হলে গাছের কর্তিত বাকল ভরাট হবেনা এবং ব্রাউনবাস্ট ঘটবে; এতে গাছের আয়ুষ্কাল ও উৎপাদন উভয়ই ব্যাহত হবে।

উৎসঃ মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ

রসকোঃ পাহাড়ের সম্ভাবনাময় ফল

রসকো Menispermaceae পরিবারভুক্ত চিরসবুজ, বর্ষজীবি, উভলিঙ্গ, কাষ্ঠল জাতীয় লতানো উদ্ভিদ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম *Haematocarpus validus* Bakh.f. ex Forman.। বাংলায় একে- রক্তগোলা বা লালগোলা, চাকমা ভাষায়- রসকো, মারমায়- রাংগুইচি এবং ইংরেজিতে- Blood Fruit বলে। ফল পাকলে গাঢ় লাল বর্ণ ধারণ করে। ফলের ভিতরটা রক্তের মতো লাল হওয়ায় ইহার এমন নামকরণ করা হয়েছে। রসকো বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিশেষ করে রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার পাহাড়ে জন্মে। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, অরুনাচল প্রদেশ, আসাম, মেঘালয়, সিকিম এবং ইন্দোনেশিয়াতেও রসকো জন্মে।

রসকো পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর অতি পছন্দনীয় ফল। এটি গভীর বন-জঙ্গলে প্রাকৃতিকভাবে জন্মায়। ইহা প্রতিকূল পরিবেশে বিশেষ করে শুষ্ক পরিবেশে এবং উচ্চ মাত্রার অম্লীয় মাটিতে জন্মাতে ও টিকে থাকতে পারে। পাতা গাঢ় সবুজ ও মসৃণ, পাতার দৈর্ঘ্য ১২ সে. মি. এবং প্রস্থ ৫.৫ সে. মি.। বীজ এবং কাটিং উভয় পদ্ধতিতে চারা উত্তোলন করা যায়। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে জানুয়ারি মাসের মধ্যে ফুল আসে। এপ্রিল-মে মাসের মধ্যে ফল পরিপক্ক হয় এবং মে-আগস্ট মাস পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা হয়। ফলের খোসা অনেক পুরু এবং ফলের ভিতরে লালচে খয়েরি রংয়ের শাঁস থাকে। এটা খেতে মিষ্টি এবং হালকা টক জাতীয়। মুখ ও ঠোঁট লাল হয় বলে

ধারকের সাথে লতানো রসকো গাছ

পরিপক্ক রসকো ফল

পাহাড়ী মেয়েরা বেশ মজা করে এটি খায়। পাহাড়ী ব্যবসায়ীরা শহর এবং উপজেলার বাজারে প্রতি কেজি ১২০-১৬০ টাকা মূল্যে বিক্রি করে থাকে। ফলের নির্যাস খাদ্যের প্রাকৃতিক রং (Food Colour) হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া এর কিছু ঔষধি গুণ রয়েছে। গাছের কচি ডাল ও পাতা বেটে খেলে জন্ডিস ভালো হয়। ইহার ফল ও বীজ রক্তশূন্যতা দূর করে এবং চুলকানি হলে শিকড় বেটে প্রলেপ দিলে উপকার হয়। এছাড়া পাতা জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

রসকো আয়রন ও এন্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ সম্ভাবনাময় ঔষধি ফল। আয়রন শিশু ও মহিলাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর ফল ও পাতায় রয়েছে প্রচুর ভিটামিন ও মিনারেল, যা আমাদের শরীরের পুষ্টির চাহিদা মেটাতে সক্ষম। ইহা প্রাকৃতিকভাবে জঙ্গলে জন্মে। কিন্তু অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ভূমিক্ষয় এবং বনভূমি ধ্বংসের কারণে এদের আবাসস্থল দিন দিন কমে যাচ্ছে। তাই বিলুপ্ত প্রায় এই দেশি ফলকে পাহাড়ের প্রাকৃতিক বনে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ করলে এবং সঠিকভাবে পরিচর্যা করলে রসকো হতে পারে পাহাড়ী জনপদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি সম্ভবনাময় অর্থকরী ফসল।

উৎসঃ বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার বসতবাড়িতে বাঁশের বংশ বিস্তার ও চাষ পদ্ধতি

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে প্রায় ৪৭,০০০ বর্গ কিলোমিটার ব্যাপী বিস্তৃত। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ১৯টি জেলার ৪৮টি উপজেলা উপকূলীয় এলাকার অন্তর্ভুক্ত। এসব এলাকায় ৬.৮৫ মিলিয়ন বসতবাড়ি রয়েছে। কৃষকেরা তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে খুব স্বল্প পরিসরে বসতভিটায় বাঁশের চাষ করে থাকে। উপকূলীয় এলাকায় বাঁশের উৎপাদন বাড়াতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বসতভিটায় বাঁশ চাষ করা প্রয়োজন। গবেষণায় দেখা যায় যে, উপকূলীয় বসতভিটায় কঞ্চি কলম পদ্ধতিতে বাঁশ (বাইজ্জ্যা বাঁশ-*Bambusa vulgaris* এবং বরাক বাঁশ- *B. balcooa*) চাষে আশাব্যঞ্জক সফলতা পাওয়া গেছে। এ পদ্ধতিতে বাঁশ চাষ করলে উপকূলীয় এলাকায় বাঁশের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এ অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

কঞ্চি কলম পদ্ধতিতে বাঁশের চারা উত্তোলন

উপকূলীয় এলাকার কৃষকেরা সাধারণত বাঁশের চাষাবাদের জন্য মুথা ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু মুথার বেঁচে থাকার হার কম হওয়ায় কৃষকেরা বাঁশ চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। কাজেই কঞ্চি কলমের মাধ্যমে বাঁশের বংশগতি অপরিবর্তিত রেখে দ্রুত বংশ বিস্তার করা সহজ। সমতল ভূমিতে চার ফুট চওড়া এবং প্রয়োজন অনুযায়ী লম্বা বেড বালি দিয়ে কমপক্ষে ২৫ সে. মি. উঁচু অথবা মাটি অপসারণ করে ১০ ইঞ্চি গভীর গর্ত করে বালি দিয়ে পূর্ণ করে বেড প্রস্তুত করতে হবে। সুস্থ সবল ১-২ বছর বয়সী বাঁশের গা ঘেঁষে আঙুলের মত মোটা কঞ্চি হাত করাত দিয়ে কঞ্চির গোড়াসহ কেটে সংগ্রহ করতে হবে। কঞ্চি কাটার পর গোড়া থেকে ৩-৫ গিট রেখে বা দেড় হাত লম্বা আকৃতিতে কঞ্চি কলম কাটতে হবে। সংগৃহিত কঞ্চি কলমের গোড়ার শল্কপত্র আঙুল দিয়ে ছাড়িয়ে বালির বেডে ৫-৮ সে. মি. দূরত্বে সারিবদ্ধভাবে ৮-১২ সে. মি. বালির গভীরে ঢুকিয়ে রোপণ করতে হবে। এরপর গোড়া সামান্য চাপ দিয়ে এঁটে দিতে হবে। বালির বেডে কঞ্চি কলম রোপণের পর ঝরনা দিয়ে দিনে ২-৩ বার নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে কোন ভাবেই যেন কঞ্চি কলম শুকিয়ে না যায়। প্রয়োজন হলে নার্সারি বেডের উপর আংশিক ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ২০-২৫ দিনের মধ্যে কঞ্চির গিট থেকে নতুন শাখা ও পাতা গজিয়ে বেড সবুজ আকার ধারণ করবে এবং কলমের গোড়ায় প্রচুর শিকড় গজিয়ে যাবে। তখন কলমগুলোকে পলিব্যাগে স্থানান্তর করতে হবে। নার্সারী বেডে প্রচুর পানি দিয়ে ভিজিয়ে শিকড়যুক্ত কঞ্চি কলম সতর্কতার সাথে বেড থেকে তুলতে হবে। শিকড়যুক্ত কঞ্চি কলমগুলি

৫ম পৃষ্ঠায়....

২২ x ১৫ সে. মি. আকারের পলিব্যাগে গোবর সার মিশ্রিত মাটি ভর্তি করে লাগাতে হবে। পলিব্যাগে স্থানান্তরিত কঞ্চি কলম ৭-১০ দিন ছায়ায় রেখে প্রতিদিন একবার পানি দিতে হবে। এরপর ব্যাগগুলো নার্সারিতে নিয়ে সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে আরো ১০-১১ মাস পরিচর্যা করতে হবে।

চর কুকরী মুকরী, ভোলা

রাঙ্গাবালি, পটুয়াখালী

চর আলাউদ্দিন, নোয়াখালী

বগা চত্ত্বর, সীতাকুন্ড

উপকূলীয় এলাকায় ৪ বছর বয়সের বাইজ্যা বাঁশের ঝাড় ।

বর্ষা শুরুর সাথে সাথে অর্থাৎ জৈষ্ঠ্য-আষাঢ় (মে-জুন) মাসে নির্বাচিত স্থানে ১৫ ফুট দূরত্বে কঞ্চি কলম রোপণের জন্য স্থান চিহ্নিত করতে হবে এবং চিহ্নিত স্থানে কাঠি পুঁতে রাখতে হবে। কঞ্চি কলম রোপণের কমপক্ষে এক সপ্তাহ আগে চিহ্নিত স্থানে ১.৫ ফুট x ১.৫ ফুট x ১.৫ ফুট গভীর গর্ত করতে হবে। গর্ত প্রতি ৫ কেজি গোবর সার, ১০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০ গ্রাম টিএসপি ও ৬ গ্রাম এমপি সার গর্তের মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত ভর্তি করে রাখতে হবে। বৃষ্টি শুরু হলে কঞ্চি কলমের পলিথিন ব্যাগটি ব্লেড দিয়ে কেটে ফেলে দিয়ে মাটির বলসহ চারাটি নির্ধারিত গর্তে লাগিয়ে দিতে হবে। চারার গোড়ায় মাটি দিয়ে সামান্য উঁচু করে মাটি চেপে দিতে হবে। কঞ্চি কলম রোপণের পর সহায়ক খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে যাতে চারা হেলে না পড়ে। গৃহপালিত গবাদিপশু কঞ্চি কলম খেয়ে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। সেজন্য কচি চারা রক্ষার জন্য প্রতিটি চারায় খাঁচা অথবা বেড়া দিতে হবে। রোপণ পরবর্তী তিন বছর পর্যন্ত বছরে দুই বার করে আগাছা পরিস্কার করতে হবে। কঞ্চি কলম রোপণের প্রথম বছরে চৈত্র-বৈশাখ (মার্চ-এপ্রিল) মাসে যখন বৃষ্টি হয় না তখন প্রতিটি চারার গোড়ায় সপ্তাহে দুই দিন এক কলস করে পানি সেচ দিতে হবে। শুকনা খড় বা লতাপাতা দিয়ে মালচিং করা যায়। চারাগাছ পোকামাকড় বা রোগ বালাই দ্বারা আক্রান্ত হলে প্রয়োজনীয় কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। নিয়মিত পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করলে কঞ্চি কলম রোপণের ৩-৪ বছরের মধ্যে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ঝাড়ে পরিণত হবে।

কার্তিক-মাঘ (অক্টোবর-ফেব্রুয়ারি) মাস বাদে সারা বছরই কঞ্চি কলম কাটা যায় তবে ফাল্গুন-আশ্বিন (মার্চ-সেপ্টেম্বর) মাস কঞ্চি কলম কাটার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। উপকূলীয় এলাকার বসতবাড়ির আশেপাশে ও তদ্‌সংলগ্ন পুকুরপাড়, খালের পাড় এবং রাস্তার ধারে বাঁশের বাগান সৃজনের জন্য স্থান নির্বাচন করতে হবে। জমির উচ্চতা ও ঢাল এমন হতে হবে যেন জোয়ারের বা বৃষ্টির পানি জমে না থাকে এবং কখনই সেখানে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি না হয়। নির্বাচিত স্থান আলোযুক্ত হতে হবে। কোন গাছের নীচে কিংবা ঘন ছায়াযুক্ত স্থানে বাঁশের চারা রোপণ করা যাবে না। চারা রোপণের জন্য নির্বাচিত স্থানের জঙ্গল ও লতাপাতা কেটে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।

উৎস: প্লান্টেশন ট্রায়াল ইউনিট বিভাগ

কলমের মাধ্যমে সেগুন বৃক্ষের বীজ বাগান উত্তোলন

বনজ বৃক্ষ প্রজাতির মধ্যে গুণগতমানের বিচারে সেগুন (*Tectona grandis*) প্রজাতিটিকে সবসময় প্রথম সারিতে রাখা হয়ে থাকে। কিন্তু এর বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অনান্য প্রজাতির তুলনায় ধীর হওয়ায় এটির বীজ উৎপাদনক্ষম হতে অনেক সময় লেগে যায়। সেক্ষেত্রে স্বল্প সময়ের মধ্যে সেগুনের মানসম্পন্ন বীজ প্রাপ্তির জন্য বীজ থেকে চারা উত্তোলন করে বাগান সৃজনের চেয়ে নির্বাচিত প্লাসট্রি থেকে সায়ন সংগ্রহ করে কলম বীজবাগান অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য। সেগুনের কলম বীজ বাগান তৈরির প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিকভাবে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

সেগুনের বীজ সংগ্রহ ও রুট স্টক তৈরি

ডিসেম্বর-মার্চ মাস সময়ই হচ্ছে সেগুনের বীজ সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। এই সময়ের মধ্যেই কলম/গ্রাফটিং এর জন্য রুট স্টক হিসাবে ব্যবহারযোগ্য চারা উত্তোলনের প্রয়োজনীয় সংখ্যক বীজ সংগ্রহ করতে হবে। বীজ সংগ্রহের পূর্বে অবশ্যই নার্সারি বেডে মাটি ও গোবর সার মিশ্রিত করে ২৩-৩০ সে. মি. পলিব্যাগে

নির্বাচিত প্লাসট্রি থেকে সায়ন/বাড সংগ্রহ

রুটস্টক থেকে গ্রাফটিং এর জন্য বাকল তোলা হচ্ছে

সংগৃহিত সায়নের সংযোজন

কলমকৃত স্থানটি পলিব্যাগের সাহায্যে মোড়ানো হচ্ছে

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়....

সংযোজিত অংশ থেকে উৎপন্ন নতুন কুঁড়ি

উৎপন্ন নতুন কুঁড়ি

নতুন কুঁড়ির বৃদ্ধি পর্যায়

কুঁড়ির বৃদ্ধি ও শক্তকরণ

নার্সারিতে শেডের নীচে তৈরীকৃত সেগুনের র‍্যামেট

বীজ বপন করতে হবে। সাধারণত মার্চ মাস হচ্ছে সেগুনের বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। সেগুনের বীজ বপনের ২০-৪০ দিনের মধ্যেই অঙ্কুরদোগম শুরু হয়। উত্তোলিত চারাগুলোকে এক বছর নার্সারিতে পরিচর্যা করতে হবে। পরবর্তীতে এই চারাগুলোই রুটস্টক হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

সেগুনের নির্বাচিত প্লাস ট্রি থেকে সায়ন/বাড সংগ্রহ ও র‍্যামেট তৈরী

পরবর্তী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে সেগুনের নির্বাচিত প্লাস ট্রি থেকে সায়ন/বাড সংগ্রহ করে এক বছর বয়সী রুট স্টকটির সাথে গ্রাফটিং করা হয়। উল্লেখ্য যে কলম/গ্রাফটিং এর জন্য অবশ্যই ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রাফটিং করার ২০-৩০ দিনের মধ্যে কুঁড়ি বের হয়। কুঁড়ি বের হওয়ার তিন সপ্তাহের মধ্যেই চারার উপরের অংশ কেটে ফেলতে হবে এবং এই অবস্থায় কলম চারাটিকে র‍্যামেট বলা হয়।

এভাবে ৭-১০ দিনের মধ্যে র‍্যামেটগুলো সতেজ হয়ে উঠলে উপরের শেডটি সরিয়ে ফেলতে হবে যাতে করে র‍্যামেটগুলো পর্যাপ্ত আলো বাতাস পায়। সমস্ত র‍্যামেটগুলো সারিবদ্ধভাবে নার্সারিতে নির্ধারিত স্থানে সাজিয়ে রাখতে হবে। এই সময় এদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় কীটনাশক/ছত্রাকনাশক এবং সার প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া নিয়মিত (২/৩ মাস অন্তর) রুট ডিস্টার্ব এর মাধ্যমে র‍্যামেটের মূল যেন মাটির নীচে চলে না যায় তা খেয়াল রাখতে হবে। এভাবে নার্সারিতে ১-১.৫ বছর সময়কাল রক্ষণাবেক্ষণ করে যেতে হবে।

সেগুনের কলম দ্বারা বীজ বাগান উত্তোলন

তৈরিকৃত র‍্যামেটসমূহ ১-১.৫ বছর সময়কাল রক্ষণাবেক্ষণের পর বাগান উত্তোলনের উপযোগী হয়। তারপর নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী কলম বীজ বাগান সৃজন ব্যবস্থা নিতে হবে। কলম বীজ বাগান সৃজন সাধারণ চারা বীজ বাগানের থেকে কিছুটা ভিন্ন। এক্ষেত্রে কলম বীজ বাগানের জন্য চারা থেকে চারার দূরত্ব সাধারণ বীজ বাগানের চেয়ে তুলনামুলকভাবে বেশি রাখা হয়।

উৎস: বীজ বাগান বিভাগ

বারৈয়াঢালা জাতীয় উদ্যানে বিরল প্রজাতির চিতা বিড়ালের সন্ধান

বিএফআরআই এর বন্যপ্রাণী শাখার গবেষকদের বন্যপ্রাণী বৈচিত্র্য অনুসন্ধানকালে চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডের বারৈয়াঢালা জাতীয় উদ্যানের বনাঞ্চলে ক্যামেরা ট্রাপে বিড়াল জাতীয় একটি

চিতা বিড়াল

প্রাণীর ছবি ধরা পড়ে। পরবর্তীতে রাতে বনের মধ্যে প্রাণীটিকে সরাসরি দেখাও সম্ভব হয়। স্থানীয় লোকজন প্রাণীটিকে চিতা বাঘ বা বাঘের বাচ্চা মনে করে থাকে । এটি আকারে বন বিড়ালের ন্যায়। তবে বন বিড়ালের তুলনায় এদের দেহ ভারী ও মোটা, পাগুলো লম্বা মোটাসোটা ও শক্তিশালী। লেজ লোমশ যা দেহের তুলনায় খাটো ও মোটা। এদের থুতনী খাটো এবং চোখ বড় বড়। পিঠের দিকটা হলুদাভ ও পেটের তলা সাদা। সমগ্র দেহ জুড়ে কালো বা গাঢ় বাদামী ফোটা লম্বা লম্বি কয়েকটি সারিতে সজ্জিত। কপালের সম্মুখ ভাগ হতে কালো ও সাদা লম্বা-লম্বি ডোরা ঘাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। উভয় গালে সাদা ছোপকে ঘিরে কালো দাগ আছে। এটি Felidae গোত্রের বুনো বিড়াল প্রজাতি যার শ্রেণীতাত্ত্বিক নাম *Prionailurus bengalensis* Kerr,1972। এরা নিশাচর বন্যপ্রাণী, গা ঢাকা দিয়ে থাকতে ও লুকিয়ে শিকার করতে পছন্দ করে।

চিতা বিড়াল দিনের বেলায় বড় গাছের গুড়ির কোঠরে, পাহাড়ে পাথরের ফাঁকে বা গুহায় লুকিয়ে থাকে ও সন্ধ্যায় শিকারের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। ঘাস সমৃদ্ধ ভূমি, ঝোপ-ঝাড় এবং বড়, পুরানো ও বয়স্ক বৃক্ষ সমৃদ্ধ বনভূমি এদের আবাসস্থল। এ স্তন্যপায়ীটির উপস্থিতি কোন বনভূমির সক্রিয় খাদ্য শৃঙ্খলের বিদ্যমান অবস্থা নির্দেশ করে। এরা বন মুরগী, মথুরা, ইঁদুর,

৭ম পৃষ্ঠায়....

খরগোশ, শুকর ও ছোট আকারের হরিণ শিকার করে। এরা সাঁতারে পারদর্শী। পাহাড়ী ঝর্ণা ও ছড়ার মাছ, কুচিয়া, কাঁকড়া, চিংড়ি, ব্যাঙ ও সাপ ধরে খায়। গাছে চড়ে পাখি, পাখির ডিম ও বাচ্চা খেতে পছন্দ করে।

এ দেশে চিতা বিড়ালের বিস্তৃতি ও বর্তমান সংখ্যা সম্পর্কে বন্যপ্রাণী গবেষকদের কাছে উল্লেখযোগ্য তথ্য ও উপাত্ত নেই বললেই চলে। বিশিষ্ট বন্যপ্রাণী গবেষক ড. আলী রেজা খানের মতে (১৯৯৬ খ্রি.) গারো পাহাড়সহ অন্যান্য বনে এরা অতি অল্প সংখ্যায় টিকেছিল। IUCN (International Union for Conservation of Nature) Bangladesh – ২০০০ প্রকাশিত "Red Data Book" এ প্রাণীটি সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে গবেষকদের অনুসন্ধানে শুধুমাত্র চট্টগ্রাম, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের কিছু অংশে স্বল্প সংখ্যায় এদের টিকে থাকার তথ্য পাওয়া গেছে। IUCN, Bangladesh–২০১৬ প্রকাশিত "Red List of Bangladesh" এ একে বিপদাপন্ন (Near Threatened) বন্যপ্রাণী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এরা বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন- ২০১৬ এর তফসিল-১ এর অন্তর্ভুক্ত সংরক্ষিত বন্যপ্রাণী। বারৈয়াঢালা জাতীয় উদ্যানের বনাঞ্চলে এই প্রথম এদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ও বিচরণের ছবি ধারণ করা হয়েছে। চিতা বিড়াল মানুষ এবং গবাদি পশু আক্রমণ করতে পারে বিধায় বনের আশেপাশের লোকেরা অনেক সময় প্রাণিটিকে হত্যার চেষ্টা করে। বারৈয়াঢালা জাতীয় উদ্যানের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, আবাসস্থল রক্ষা ও উন্নয়ন, এবং এদের বিচরণ ও প্রজননের সুযোগ সৃষ্টি করা হলে এরা বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে ।

উৎস: বন্যপ্রাণী শাখা।

বাঁশের মোল্ডেড চেয়ার

বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কাঠের চাহিদা মেটাতে বন ধ্বংস হচ্ছে। কাঠের বিকল্প হিসেবে বাঁশের পণ্য তৈরি এবং ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে বনভূমি ধ্বংস কমিয়ে আনা সম্ভব। কারণ একটি বাঁশ মাত্র ৩-৫ বছরে ব্যবহার উপযোগী হয় এবং একটি পরিপক্ক বৃক্ষ হতে ব্যবহারের কাঠ পেতে অপেক্ষা করতে হয় প্রজাতিভেদে ২০-২৫ বছর। প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাঁশের পণ্য টেকসই এবং যোজিত পণ্য তৈরি করে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

বাঁশের মোল্ডেড চেয়ার একটি যোজিত পণ্য। বাঁশের তৈরীকৃত ম্যাট, কাঠের ভিনিয়ার, বাঁশের প্যানেল বোর্ড এর সমন্বয়ে এই মোল্ডেড চেয়ার তৈরি করা হয়।

বাঁশের ম্যাট প্রস্তুতের জন্য তিন বছর বয়সী মিতিংগা বাঁশকে ব্যাম্বো স্প্লিটার মেশিনের সাহায্যে ফালি করা হয়। উক্ত ফালিগুলো থেকে ০.৬ মি. মি. পুরুত্ব বিশিষ্ট পাতলা ফালি তৈরি করে শুকানোর জন্য রাখা হয়। শুকানো ফালিগুলো দিয়ে সুবিধামত আকৃতি বিশিষ্ট বাঁশের ম্যাট প্রস্তুত করা হয়।

বাঁশের মোল্ডেড চেয়ার

বাঁশের প্যানেল বোর্ড তৈরির জন্য নির্দিষ্ট মাপের বাইজ্যা অথবা বোরাক বাশেঁর টুকরাকে স্প্লিটার মেশিনের সাহায্যে ৮-১০ ফালি করে বুক ও পিঠের দিক সমান করার পর শুকানো হয়। এরপর শুকনো বাশেঁর ফালিগুলো প্লানার মেশিন দিয়ে মসৃণ করে স্ট্রিপ তৈরি করা হয়। এরপর স্ট্রিপ এমনভাবে শুকাতে হবে যেন জলীয় অংশ শতকরা ২০ ভাগের বেশি না থাকে।

ম্যাট, স্ট্রিপ ও ভিনিয়ারের স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য ১০% বোরাক্স-বোরিক এসিডের (১:১) সংরক্ষণী দ্রবণের মধ্যে দুইদিন (৪৮ ঘন্টা) ডুবিয়ে রাখা হয়। সংরক্ষণী দ্রবণে বাশেঁর স্ট্রিপ গুলো ডুবানোর পর ৮-১০% জলীয় অংশ শুকিয়ে ইউরিয়া ফরম্যালডিহাইড গ্লু ব্যবহার করে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে চেয়ারের পা তৈরি করা হয়।

বাঁশের ম্যাট ২টি সামনে- পিছনে এবং কাঠের ৫টি ভিনিয়ার মাঝখানে দিয়ে গ্লু লাগিয়ে কোল্ড প্রেসে চাপ দেয়া হয়। এভাবে আলাদাভাবে সিট ও ব্যাক তৈরি করা হয়। ডিজাইন সমৃদ্ধ ম্যাট ব্যবহার করে আকর্ষনীয় বাঁশের মোল্ডেড চেয়ার তৈরি করা যায়।

উৎসঃ কাষ্ঠ যোজনা বিভাগ।

গাইনুরা (Gynura) ঃ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভেষজ উদ্ভিদ

গাইনুরা ছোট গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ যার বৈজ্ঞানিক নাম *Gynura procumbens*। ইহা Asteraceae পরিবারভুক্ত। এই উদ্ভিদটিকে Longevity spinach নামেও অনেকে অভিহিত করে। চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিশেষত: মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া এবং আফ্রিকাতে এই উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া যায়। চমৎকার ঔষধি গুণের কারণে বর্তমানে বিশ্বব্যাপী এই উদ্ভিদের ব্যবহার ও প্রসার বাড়ছে।

গাইনুরা একটি ঔষধি গুণ সম্পন্ন উদ্ভিদ এবং পাতা ডায়াবেটিস নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। এর পাতা ৪- ৮ সে. মি. পর্যন্ত লম্বা

৮ম পৃষ্ঠায়....

এবং ১ - ৪ সে. মি. পর্যন্ত চওড়া হয়। পাতা রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ ডায়াবেটিস রোগে উপকারি বলে সমগ্র বিশ্বব্যাপী এটি একটি আশ্চর্যজনক ঔষধি গাছ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। তাই এটি ডায়াবেটিক প্লান্ট নামে বেশি পরিচিত। প্রতিদিন সকালে খালিপেটে ২-৩ টি পাতা সেবন করলে রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণে থাকে। এটি রক্তের কোলেস্টেরলকে কমিয়ে দেয় এবং উচ্চ রক্তচাপের কারণে কিডনী ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া থেকে রক্ষা করে। একজন সুস্থ ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে খালি পেটে ২ টি পাতা সেবন করলে ডায়াবেটিস, উক্ত রক্তচাপ জনিত সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। চীনসহ সারা বিশ্বে এটির ব্যবহার এন্টি-ভাইরাস হিসেবে খুব পরিচিত। জাভা এলাকার আধিবাসীগণ কচি পাতাসহ কান্ড সবজি হিসেবে খেয়ে থাকেন। সিংগাপুরের অধিবাসীগণ গাইনুরার পাতাকে পানিতে সিদ্ধ করে এক ধরণের উপাদেয় খাবার তৈরি করে থাকেন। আফ্রিকার অধিবাসীগণ গাইনুরার পাতা সিদ্ধ করা পানি শরীরে বাত-ব্যথা জনিত সমস্যার জন্য বাহ্যিকভাবে ব্যবহার করে থাকেন। এছাড়া চর্ম রোগ সম্পর্কীয় সমস্যার সমাধানের জন্য গাইনুরার শুকনো পাতা গুঁড়া করে তেলের সাথে মিশিয়ে মালিশ হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন।

গাইনুরার বীজ সহজলভ্য নয়। তবে কাটিং এর মাধ্যমে সহজে বংশবিস্তার করা যায়। সহজে পানি নিষ্কাশনযোগ্য আর্দ্রতাসম্পন্ন উর্বর মাটিতে এর বৃদ্ধি ভাল হয়। ১০-১২ ইঞ্চি টবে মাটি ও গোবর সার ভাল করে মিশিয়ে কাটিং লাগিয়ে বাড়ির ছাদে বা বারান্দায় চাষ করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে প্রতিদিন সকাল বিকাল পরিমিত পানি দিতে হবে এবং রোপণের প্রাথমিক পর্যায়ে হালকা ছায়া দিতে হয়। একটি বা দুইটি পর্বসহ ডাল কেটে লাগালে ১৫-২০ দিনের মধ্যে নতুন পাতা গজাতে শুরু করে। গাছটি অল্প সময়ে দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এক মাস পরে আগা কেটে দিতে হয় ফলে গাছটি ঝোপের মত হয় এবং বেশি পরিমাণে পাতা গজায় নতুবা একটি মাত্র কান্ডসহ উপরের দিকে বাড়তে থাকবে এবং পাতাও কম গজাবে। যত বেশি আগা বা ডাল ছাটাই করে দেয়া হবে তত বেশি পাতা গজাবে। প্রথমে কাটিং করার এক থেকে দেড় মাস পর পাতা সংগ্রহ করা যাবে এবং পরে প্রতিদিন কিছু পাতা সংগ্রহ করা যাবে।

উৎসঃ গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগ।

গাইনুরা কাটিং

পলিব্যাগে গাইনুরা কাটিং

নার্সারি বেডে গাইনুরা উদ্ভিদ

টবে গাইনুরা উদ্ভিদ

সম্পাদনা ও প্রকাশনা কমিটি

উপদেষ্টাঃ ড. শাহীন আক্তার	- পরিচালক	ড. খুরশীদ আকতার	- উপদেষ্টা	ড. মোহাম্মদ মহীউদ্দিন	- উপদেষ্টা
মো. জাহাঙ্গীর আলম	- আহবায়ক	মো. রওশন আলী	- সদস্য-সচিব	ড. মো. আহসানুর রহমান	- সদস্য
মো. মতিয়ার রহমান	- সদস্য	অসীম কুমার পাল	- সদস্য	মো. জহিরুল আলম	- সদস্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

E-mail: editorbfrinewsletter@gmail.com, web: www.bfri.gov.bd

ফোন ঃ ০৩১-৬৮১৫৭৭, ২৫৮০৩৮৭, ২৫৮০৩৮৮